নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, রবিবার, ০৩ বৈশাখ ১৪২৪, ১৬ এপ্রিল ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ,

মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে আমরা ৯-মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছি। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এক দীর্ঘ সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাঙালি পেয়েছে নিজস্ব আবাসভূমি। ১৯৪৭ সালের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ২৪ বছর পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। বার বার জেলে গিয়েছেন। নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তিনি আপোষ করেননি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৫১'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬-দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচনের পথ বেয়ে বাঙালি'র সংগ্রাম চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। পাকিস্তানিদের দমন-পীড়ন এবং হুমকি উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহবান জানান। ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের নামে গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর - রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী - মাত্র নয় মাসে ৩০ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। ২-লাখ মাবোনের সম্ভ্রমহানি করে। লাখ, লাখ বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। সম্পদ লুটপাট করে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের স্বীকৃতি আদায় করেন।

কিন্তু দেশে-বিদেশে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা থমকে যায়।

সুধিবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তারা মুক্তিযুদ্ধের নাম নিশানা মুছে ফেলে পাকিস্তানের ভাবাদর্শের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। পাকিস্তান জিন্দাবাদের আদলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে রেডিও পাকিস্তানের ন্যায় রেডিও বাংলাদেশ করা হয়। সবকিছুতেই পাকিস্তানী ভাবধারা ফিরে আসে। গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নাম নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইবুনালস) আইন, ১৯৭৩ প্রণয়ন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছিলেন। স্বৈরশাসক জিয়া অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেই সাড়ে ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে মুক্তি দেয়। তাদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে। শাহ আজিজ, আব্দুল আলীমদের মত চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করে। বঙ্গবন্ধু গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন। জিয়া তাকে দেশে নিয়ে আসে। জিয়ার পথ অনুসরণ করে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াও নিজামী-মুজাহিদ-সাকা চৌধুরীদের মন্ত্রী বানান।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে। একমাত্র আওয়ামী লীগই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে সক্ষম।

৭৫'র পর আওয়ামী লীগ ২১ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে ছিল। বাংলাদেশ ভিক্ষুকের দেশে পরিণত হয়েছিল। বিদেশি সাহায্য ছাড়া বাজেট তৈরি হত না। খাদ্য সাহায্যের জন্য হাত পেতে থাকতে হত। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা তো দূরের কথা, তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার করা হয়। অন্যদিকে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক-অফিসারকে জিয়া হত্যা করে। তাদের আমলে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন সম্মান ছিল না। মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিতে ভয় পেত। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

আমি কথা দিয়েছিলাম আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করব। আমরা সে কথা রেখেছি। কোন হুমকি-ধামকি আমাকে থামাতে পারেনি। কারণ, আমার শক্তি এদেশের মানুষ। মানুষের কল্যাণেই আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি।

সুধিবৃন্দ,

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মর্যদা দিতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় অংশ ছিল গ্রামের দরিদ্র পরিবারের। তাঁদের অনেককেই বৃদ্ধ বয়সে দুঃস্থ জীবন-যাপন করতে হচ্ছিল। আমরা সকলের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।

আমরা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে ১০ হাজার টাকায় এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা এক লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখে উন্নীত করেছি।

৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাসিক ৩০ হাজার টাকা, বীরোত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাসিক ২৫ হাজার টাকা, বীর-বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা এবং বীর- প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাসিক ১৫ হাজার টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ পঙ্গুত্বের ধরণ অনুযায়ী মাসিক সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকা এবং মাসিক সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার মাসিক ৩০ হাজার টাকা, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার মাসিক ২৫ হাজার টাকা সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে স্বল্পমূল্যে রেশনসামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া তাদের উৎসব ভাতা, চিকিৎসা-খরচ (দেশে-বিদেশে), জাতীয় পরিচয়পত্র, পানি ও পয়নিস্কাশন বিল, বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল মওকুফ এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষাভাতা, বিবাহ ভাতাসহ (কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে) আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। শহিদ এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ঢাকার মোহাম্মদপুরের গজনবী সড়কে ১৫-তলা বিশিষ্ট আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ২২৭ দশমিক নয়-সাত কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ১ হাজার ৯৫৮টি ইউনিটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান এবং সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

'জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি ভবনের মধ্যে ৪৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪৭০টি উপজেলায় 'উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন' নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৭০টি 'উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লক্স ভবন'-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি জেলার ৬৫টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা কর্মচারিদের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা নির্ধরণ করা হয়েছে।

২৫ শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত জাতীয় সংসদ এবং মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত হয়েছে। গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

সুধী,

১৯৯৫ সালে আটজন ট্রাস্টি যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, সেই প্রস্তুতিপর্বে আমি তাঁদের উৎসাহ দিয়েছি; তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।

আমি এই স্থায়ী জাদুঘর নির্মাণের জন্য আগারগাঁও এ জমিটি হস্তান্তর করেছি। অর্থাভাবে যাতে জাদুঘর নির্মাণ ব্যাহত না হয়, সেজন্য প্রস্তাব আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে জাদুঘরের পক্ষে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করেছি। বিগত সাত বছর যাবৎ জাতীয় বাজেটে এই জাদুঘরের জন্য আর্থিক বরাদ্দ রেখেছি। তবে সকলের সহায়তা ছাড়া এ জাদুঘর নির্মাণ করা সম্ভব হত না। যাঁরা অনুদান দিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জাদুঘর অতীত জানার এবং ইতিহাস শিক্ষার স্থান। অতীতের উপরই ভবিষ্যত নির্মিত হয়। আজকের প্রজন্ম যদি না জানে যে এই দেশ স্বাধীন করতে কত মানুষ রক্ত দিয়েছে, কত মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে, কত মানুষ অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগবে কী করে?

বই-পুস্তক পড়ার পাশাপাশি জাদুঘরে সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নগুলো মানুষকে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে। আমার প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন প্রজন্মকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা এবং ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করতে অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সঠিক ইতিহাস চর্চা না থাকার কারণে কিছু কিছু তরুণ ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন তরুণ এ ধরণের ভুলপথে পা বাড়াতে পারে না। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠিই পারবে আজকের এই সঙ্কট মোকাবিলা করতে।

আমাদের লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সুখী, সমৃদ্ধ শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা; যে বাংলাদেশের জন্য জাতির পিতা আজীবন সংগ্রাম করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাগণ আত্মত্যাগ করেছেন। আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করি, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলি। তাহলেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারব।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...